দৈনিক সংবাদ

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 30 APR 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

সহিংসতার বেড়াজালে

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

ক'দিন আগে যে সহিংসতার ঘটনা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘটে গেল, আজকের আলোচনা সেই প্রসঙ্গে। কি ঘটেছিল, কে দোষী বা কতটা দোষী, সেটা আমার বিবেচনার বিষয় নয়। এবং এত দূর থেকে সে-সম্বন্ধে কোন মতামত দেয়াও সম্ভব নয়। সহিংসতা ঘটনা হিসেবে, বিশেষতঃ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এখন আর নৈমিত্তিক নয়, নিত্যদিনের ঘটনায় দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন হয়তো রক্তারক্তির পর্যায়ে পৌঁছায় না। তবে প্রায়শই আবহাওয়া এমন উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে থাকে যে, মনে হয় বারুদে অগ্নিস্পর্শ হলেই প্রলয়কাণ্ড ঘটে যাবে। শুরু হবে ধাওয়া, পাল্টা ধাওয়া, ফুটবে পটকা-হাতবোমা, মলোটভ-ককটেল, অদৃশ্য আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসবে ইস্পাতের ফলা, আর পূর্ব-সঞ্চিত উত্তেজনা যদি একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় পৌঁছে থাকে, তাহলে এসব কিছু নয়, আরো মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র নিজেকে ঘোষণা করবে রণাঙ্গনে। কারণ ক্যাম্পাস তখন আক্ষরিক অর্থেই ভিন্নতর 'ময়দানে' পরিণত হবে।

এ-রকমই হয়ে আসছে, বেশ কিছুদিন থেকে। রাজশাহীর শেষতম সহিংসতার ঘটনা এরকম অসংখ্য ঘটনার ছকেই ঘটেছে বলে অনুমান করি। অর্থাৎ বিবদমান কয়েকটি ছাত্র দলের মধ্যে সংঘর্ষ। কিছু একটা ঘটতে পারে, অনেকেই এমন ভয় করছিলেন বলে শুনেছি। একটা ছাত্র সংসদীয় নির্বাচন যদিও বা নির্বিঘ্নে হয়ে গিয়েছিল, তবু ভয়টা উঁকি মারছিল অনেকেরই মনে। একটি বিশেষ ছাত্রদলের মধ্যে দেখা গিয়েছিল একটা চাপা অসন্তোষ, এবং সে অসন্তোষের পথ ধরে কিছু একটা ঘটে যেতে পারে, এমন একটি আশংকা লক্ষ্য করেছি রাজশাহীর বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে। প্রসঙ্গত বলে রাখি দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নানা কাজে অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষকদের আসা-যাওয়া একটা নিয়মিত ঘটনা। সুতরাং ঘরে বসেই এসব খবর পাওয়া যায়।

তবু এবারের এই সহিংসতা, যার ফল হিসেবে একজন ছাত্র মৃত্যু বরণ করেছে, একেবারে মামুলি নয়। কারণ একদল ছাত্র নিজেদের মধ্যে মারামারিতে থেমে যায়নি, আক্রমণ করেছে উপাচার্য ভবন, টেলিফোনের তার কেটে দিয়েছে, ভাঙচুর করেছে, বোমা ছুড়েছে বাড়ী লক্ষ্য করে। এমনও শুনেছি উপাচার্য ঐ সময় বাড়ীতে উপস্থিত থাকলে তার উপর আক্রমণ হত এবং কিছু একটা ঘটে যাওয়া অসম্ভব ছিল না।

এটা যে কোন অতিরঞ্জিত বর্ণনা নয়, তার প্রমাণ পাই যখন দেখি বিভিন্ন মহল থেকে শুধু এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়নি, শুধু একজন ছাত্রের মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করা হয়নি, উপাচার্য ভবনে হামলাকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে। অর্থাৎ এই হামলাকে এ ধরনের সহিংস ঘটনার স্বাভাবিক অঙ্গ বিবেচনা করা হয়নি, এর মধ্যে একটি নতুন তাৎপর্য, একটি নতুন বিপদের সম্ভাবনা লক্ষ্য করে সবাই এর নিন্দা করেছেন। এই নিন্দা এসেছে ছাত্র মহল থেকে, শিক্ষক-সংগঠন থেকে, রাজনৈতিক মহল থেকে। সরকারী মহল থেকে কোনরূপ নিন্দা বা উদ্বেগ প্রকাশ করা হলেও আমার চোখে পড়েনি।

ছাত্রদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-কলহের মধ্যে যদি কলেজের অধ্যক্ষ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে জড়ানো হয়, তবে তার চেয়ে দুঃখের আর কিছু হতে পারে না। আমি জানি, যারা এভাবে জড়ান কোন কর্তৃপক্ষকে, তাঁরা সচরাচর একটা অভিযোগ এনে থাকেন, পক্ষপাতিত্বের। আমি এ-ও জানি, বর্তমান পরিস্থিতিতে এবং পরিস্থিতি বলতে আমি শুধু শিক্ষাঙ্গনের নয়, সার্বিক অর্থে দেশের পরিস্থিতির কথাও মনে রেখেছি—কোন অধ্যক্ষ বা উপাচার্যের পক্ষে সহজ নয় কোন পক্ষ অবলম্বন করা। দু'একজন ব্যতিক্রম বাদ দিলে সবাই সচেষ্ট থাকেন, ছাত্রদের দলীয় কোন্দলে না জড়াতে। পক্ষ গ্রহণ একজন প্রশাসকের কাজকে সহজ করবে না, বরং জটিল করে তুলবে। একজন অধ্যক্ষ বা উপাচার্য প্রশাসকই শুধু নন, একজন শিক্ষকও, এবং ছাত্রবিশেষ বা ছাত্র দল বিশেষকে তিনি যতই পছন্দ বা অপছন্দ করুন না কেন, তাঁর নিজের দায়িত্ব পালনের স্বার্থেই তাঁকে নিরপেক্ষ হতে হবে। এ নীতি থেকে বিচ্যুত হলে তাঁরই বিপদ সবচেয়ে বেশী।

উপাচার্য ভবনে আক্রমণ থেকে বোঝা যায় যে আক্রোশটা শুধু প্রশাসনের উপর নয়। তা যদি হত তাহলে তার প্রকাশ নিম্নরূপ হত, হয়তো প্রশাসন ভবনে উপাচার্য ঘেরাও হতেন। এধরনের ঘটনা সবগুলো ক্যাম্পাসেই ঘটেছে। রাজশাহীতেই একজন উপাচার্য একবার অনশন অবস্থান ধর্মঘটরত একদল ছাত্র দ্বারা সারারাত ঘেরাও হয়েছিলেন। ভোরের দিকে যখন ঘেরাও তুলে নেয়া হল, তখন উপাচার্য ছাত্রদেরকে মৃদু হেসে বলেছিলেন, তোমাদের অনশন ছিল পোশাকী, আর আমারটা বাস্তব। অর্থাৎ আপাতদৃষ্টে ঘটনাটা যাই হোক, কোন পক্ষই অপর পক্ষকে শত্রু জ্ঞান করেনি, করলে ঘটনার নিষ্পত্তি এভাবে হত না।

এবার আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি। ছাত্রদের অনশন চলছে, এবং সেই সঙ্গে অবস্থান ধর্মঘট: মূল দাবী, যতদূর মনে পড়ছে, শতকরা একশ' জন ছাত্রের জন্য আবাসিক বৃত্তি। আমি তখন শহরে, ঢাকায় থাকি। সুতরাং শারীরিকভাবে ঘেরাও হতে হয়নি। যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে, শিক্ষকেরা

দৈনিক সংবাদ

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 30 APR 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

মধ্যস্থতা করছেন। অনশনরত ছাত্রদের শিরায় যথানিয়মে গ্লুকোজ পুশ করে চলেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার, আর আমাকে ভরসা দিচ্ছেন, স্যার ঘাবড়াবেন না, অনশনে কেউ মূর্ছা যাবে না, প্রচুর পুষ্টি সরবরাহ করা হচ্ছে ওদের শরীরে। তারপর একদিন এল, যেদিন অনশন ভাঙার পালা। প্রায় মধ্যরাতে আমাকে ছুটতে হয়েছিল এক-ঝুড়ি কমলা নিয়ে ছাত্রদের অনশন ভাঙাতে। সেকি ক্রন্দন-ব্যাকুলতা, আমি আজও ভুলিনি।

আমি মনে করি এটাই স্বাভাবিক। একটা দ্বন্দ্বের পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে, তবে সহিংসতার নয়। অথচ তাই হচ্ছে, এবং এত ঘন ঘন হচ্ছে, এবং বলতে গেলে প্রায় সব কটি ক্যাম্পাসে হচ্ছে যে আমাদের চিন্তা করতে হবে, কোন সামাজিক শক্তি কাজ করছে এই সহিংসতার পিছনে।

ক'দিন আগে ওই যে প্রায়-সদ্য-বিবাহিত বধূটি নিহত হল তার স্বামীর হাতে। প্রায় প্রতিদিনই যে দেশের কোথাও-না-কোথাও স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন হচ্ছে, স্ত্রীর মুখে স্বামী অ্যাসিড ছুড়ছে, অপরাধের এইরূপ এই মাত্রা থেকে অনুমান করা যায় পুরা সমাজটা এক দারুণ অসুস্থতার শিকার হয়ে পড়েছে। বিশেষতঃ তরুণ সমাজের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতার একটা বড় দায় চাপানো হচ্ছে নানা জাতের মাদকের ব্যাপক ব্যবহারের উপর। কিন্তু ক্যাম্পাসের সহিংসতার সঙ্গে যে মাদকের সাক্ষাৎ সম্পর্ক, তা সম্ভবত গাঁজা-চরস-হিরোইন ততটা নয়, কিংবা একেবারেই নয়—এর সম্পর্ক এক সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের মাদকের সঙ্গে—মতবাদের মাদক।

বিভিন্ন মতবাদে যেমন সমাজ বিভক্ত তেমনি ছাত্র সমাজও। মতবাদের ক্ষেত্রে মনে হয় কিছু দিন থেকে একটা মেরুকরণ ঘটে গেছে। গণতান্ত্রিক সমাজে বিভিন্ন মতবাদের এক ধরনের সহাবস্থান থাকবে এবং কিছুদিন পরপরই ব্যালট বাক্স বলে দেবে, কোন মতবাদের পক্ষে কতজন আছে। এপর্যন্ত দেখা যায়নি কোন গণতান্ত্রিক সমাজে কোন চরমপন্থী দল, কোনও উগ্রমতবাদ জনসাধারণ গ্রহণ করেছে। স্বৈরাচারের আশ্রয় ছাড়া, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া এমনটি ঘটেনা। পাকিস্তানের সাম্প্রতিক নির্বাচনে প্রমাণ করেছে, স্বৈরশাসকের মৃত্যু বা পতনের সঙ্গে সঙ্গে কেমন অপচ্ছায়ার মত মিলিয়ে গেল পশ্চাদমুখী রাজনীতির, প্রতিক্রিয়ার প্রেতমূর্তি।

দেশে নির্বাচন নেই, গণতন্ত্র নেই, অর্থনীতি পঙ্গু, জাতীয় লক্ষ্য ও আদর্শ নিত্যনব বিকৃতির শিকার, এবং সবচেয়ে মারাত্মক কথা, বিরাজমান ও বিস্তারমান বেকারত্ব। মাদকাসক্তি এই দরিদ্র দেশে দক্ষিণ বাতাসে উড়ে আসেনি, এসেছে গভীর নৈরাশ্যের সুড়ঙ্গ পথে। আমরা মাদকাসক্তির অপকার নিয়ে চীৎকার করতে পারি, কেউ কেউ মাদকের ব্যবসায়ে রাতারাতি কোটিপতি হতে পারি, কেউ কেউ দু'টি ভূমিকাই এক ঐন্দ্রজালিক শক্তি বলে এক করে ফেলতে পারি, কিন্তু কারণের দিকে না গিয়ে, শুধু লক্ষণ নিয়ে আমাদের এই প্রচারমুখী তৎপরতায় রোগের চিকিৎসা নেই, এটা নিশ্চিত।

মতবাদের বিভিন্নতা আমরা অবশ্যই স্বাভাবিক বলে মেনে নিতে পারি। কিন্তু বিভিন্নতা থেকে বৈরিতা এবং বৈরিতা থেকে সহিংসতা যখন জন্ম নেয় তখনই বুঝতে হবে "আমাদের ডেনমার্কে কোথাও পচন ধরেছে।" এই পচনের যে চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই সে হল স্বৈরশাসন ও অপশাসন। সমস্ত রোগের মূল এখানেই।

এদিক দিয়ে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি ছাত্র সংসদীয় নির্বাচনকে সীমিতভাবে হলেও গণতন্ত্রের দিকে একটি ছোট পদক্ষেপ গণ্য করতে হয়। ছাত্র সংসদ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালায় না, তার কার্যক্রম মূলতঃ ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাতিরিক্ত কর্মকাণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এখানেও একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। অতীতে ছাত্র সংসদের নির্বাচনে রাজনৈতিক বক্তব্য বলতে গেলে অনুপস্থিত থাকত, বড় জোর শিক্ষায়তন সম্পর্কিত কিছু অভাব-অভিযোগ-দাবীর কথা উত্থাপিত হত। এখন ঘরের কথার চাইতে দেশের কথাই যেন বেশী শোনা যায়। দোষ দেব কাকে? এটা তো আর গোপন থাকছে না যে দেশ ঠিক মত না চললে কোন কিছুই চলে না। বলা যায়, ছাত্ররা রাজনীতিকে টেনে আনেনি, রাজনীতিই বা অন্যভাবে বলতে গেলে রাজনীতির শূন্যতাই—ছাত্রদেরকে টেনে আনছে ওই আপাত অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গে।

ছাত্র সংসদীয় নির্বাচন বা অন্য কোন 'ইস্যু' উপলক্ষে যে অহরহ সংঘাত, এর মধ্যে একটি লক্ষণীয় দিক হল চর দখলের মত হল দখলের চেষ্টা। এ-ও এক নতুন উপসর্গ—যার প্রকৃতি ও গুরুত্ব বুঝতে আমার বেশ সময় লেগেছে। ছাত্রদের হলকে এখন যেন আর নিছক আবাসিক ভবন বলে মনে করা হচ্ছে না। একটা সম্ভাব্য সময়ের কথা মনে রেখে এক একটি ঘাঁটি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। কিংবা হয়তো, পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা ও সন্দেহ এমন একটি স্তরে পৌঁছেছে যে সেই সঙ্গে এসেছে একটি নিরাপত্তাহীনতার বোধ। কোন হলে 'সংখ্যালঘু' হিসেবে বাস আর নিরাপদ মনে হচ্ছে না, অন্ততঃ কারো কারো কাছে।

যদি কেউ বলেন, সবই তো বুঝলাম, তো হল বা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন করছেটা কি? এখনে মাফ করবেন আমাকে, বলতেই হবে, দেশের প্রশাসন দুর্বল বা রুগ্ন হলে তা দেশের সর্বাংগে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য। চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা অফিসের সময় বেঁধে দিচ্ছে—সর্বোচ্চ প্রশাসন সেটা মেনে নিতে পারছেন, বা বাধ্য হচ্ছেন। হল প্রশাসন ত তুলনায় ছার। তাঁকে দোষ দেবেন কোন্ অজুহাতে?